সংযোগ বিপ্রয়োগান্তাঃ
মিহির সেনগুপ্ত

সময়টা নব্বই –এর দশকের মাঝামাঝি, কি শেষের দিকে সম্ভবত। তখন আমি মধ্য চল্লিশও পেরিয়েছি, তবে পঞ্চাশের উপরে অবশ্যই নয়। ওই বুড়ো দামড়া বয়সে লেখালেখির জগতে সাধারণত কেউ ঢোকে না। আমারও তেমন কোনও বাসনা ছিল না। তবে কিছু খ্যাতনামা লেখক কবিদের সঙ্গে ওঠন্তি-বসন্তি, গা-ঘেঁষাঘেষি ছিল নানাবিধ কারণে। কারণগুলো নির্দোষ, নিরিমিষ্যি ছিল না কিন্তু কথা সেসব বেলেল্লাপনা বিষয়ক নয়।

সুবর্ণরেখা প্রকাশনীর কলেজ স্ট্রিটের আড্ডায় তখন খুব যেতাম। উপলক্ষ্য উন্দ্রদা অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সরস সান্নিধ্য এবং সুপ্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য নানান বই গ্যাঁড়ানো। সেখানে নানা মাপের কবি, সাহিত্যিক এবং বিচিত্র সব গুণে গুণবান মানুষেরা আসতেন। তবে সুবিধে ছিল, সেখানে তাঁরা কোনরকম জ্ঞানচর্চা করতেন না। স্থানটি ছিল মগজ-শ্রমিক মানুষের প্রয়োজনীয় বই পুস্তক সংগ্রহ এবং চিত্ত-বিশ্রামের চটুকুলা বার্তালাপের কেন্দ্র। আমার সেখানে ভিন্নতর কর্ম থাকতে। লেখক অভিজিৎ সেন তখন বালুরঘাট শহরের বাসিন্দা। তাঁর লেখাপত্তর কিছু এক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশ হত। নির্মাল্য আচার্য মশাই এক্ষণ –এর সম্পাদক এবং তাংর দপপ্তরীয় কর্মকান্ড সুবর্ণরেখাই হত। অভিজিৎ আমার অন্যতর সহোদর এবং জ্যেষ্ঠ। সুতরাং তার লেখাপত্তর নির্মাল্যদার কাছে পৌঁছোনোর, খবরাখবর আদানপ্রদানের পিত্তনের কাজটা আমাকে করতে হত। এক দুপুরে সুবর্ণরেখায় গিয়েছি, সেদিন আড্ডা ফাঁকা। শুধু ইন্দ্রদা এবং আর একজন এলোমেলো ভুতোচেহারার লোক বসে ছিলেন। ভদ্রলোগ, ওই পথেঘাটে যাদের আমরা সাধারণত লোকগুলো বলি, তাদেরই মতো একজন বলে আমার মনে হয়েছিল। তাঁকে দেখে আমার কোনও কৌতূহল জাগল না। তাঁর মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। গায়ে আধময়লা ফতুয়া এবং পরনে পাজামা। তাঁরা দুজনেই কদাচিৎ দু-একটা কথা বলেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি মানুষটিকে আমার একেবারেই ইম্প্রেসিভ মনে হল না। ইন্দ্রদাও তাঁর সঙ্গে আমার কোন পরিচয় করিয়ে দিলেন না। মানুষটি একটার-পর –একটা বিড়ি খেয়ে যাচ্ছিলেন। আমি নিজেও প্রখর ধূমপায়ী। তবে আমি সিগারেট খাই। এবং বেশিই খাই। ইন্দ্রদা আমার সিগারেট দু-একটা খাচ্ছিল।

হঠাৎ ভদ্রলোক একটা সময় যেন আমার উপর খেঁকিয়ে উঠলেন। বললেন, ধুর মশাই, সেই এসে থেককে তো একটার-পর-একটা সিগারেট টেনেই যাচ্ছেন। আমিও ঠেটার মতো বলে উঠলাম, আপনার একের-পর-এক বিড়ি ফোঁকাটা কি বাল্য প্রেমিকার ওষ্ঠে অনুরাগের চুম্বন?

ইন্দ্রদা হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন, আরে হতভাগা, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস? উনি ডাক্তার ভূমেন্দ্র গুহরায়, আরে উনি কবি জীবনানন্দের অপ্রকাশিত লেখা-পত্তর নিয়ে মস্ত কাজ করছেন। নাম শুনেছিস? ভদ্রলোককে বললেন, ও মিহির, নয়া উদ্যোগের পার্থশঙ্কর ওর কিছু বই প্রকাশ করেছে। পার্থ তো আপনার বইও করে। আমি ভবাবছিলাম, ইতিপূর্বে আপনাদের আলাপ হয়ে গেছে। ও অভিজিৎ সেনের ছোটো ভাই।

আমার পরিচিতি এবং পড়াশোনা যত লজ্জাজনক ভাবেই খাটো মাপের হোক না কেন, ভূমেন্দ্র গুহর নাম জানব না এতবড়ো জীবনানন্দ বর্জিত মানুষ আমি নই। সুতরাং একলাফে উঠে তাঁকে প্রমাণ করতে গেলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনার সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম পার্থ আমাকে দিয়েছেন। সার্থক নাম। ভাষা প্রকৃতই ওই কি বলে, সাবল্‌টার্ন ভাষা। আমার খুব ভালো লেগেছে। ইন্দ্রদা বললেন, ওর আসল পরিচয় হচ্ছে ও বিরশালিয়া এবং এখনও প্রায় নিয়মিত সেখানে যাতায়াত আছে। ও তপনবাবুর চেলাও। ভূমেনদা বললেন, জানি। পার্থ আমাকে এককপি ভাটিপুত্রর পত্র বাখোয়াচ্ছি বইটিও দিয়েছে। ঢাকাই বাংলাটা সাহিত্য সংলাপে চাকর-বাকরদের ভাষা হয়েছিল। উনি বরিশালি ভাষাটার একটা সুন্দর নামকরণ করে, তাকে সরাসরি সাহিত্যের ভোজসভায় হাজির করেছেন। নামটি হল চান্দ্রদ্বীপি। মিহির কী জানে যে আমিও বিরশালি?

-বললাম, ভিভা সলিডারিটি অব বরিশাল। আপনার গ্রাম কোথায় ছিল?

-বৈশালী। চেনেন।

-নামে জানি। অবস্থানও জানি। যাইনি কবনও। আপনার যাতায়াত আছে?

-না। আমি ঘর পালানো ভবঘুরে। তবে সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম পড়ে খুব নস্ট্যালজিক আকর্ষণ বোধ করছি একবার যাবার। আপনার সঙ্গে গেলে হত। দাঁড়ান পাসপোর্টটা করি। পার্থকেও বলেছিলাম। যাকগে, দেখা যাবে। এখন কি লিখছেন?

-একখানা বড়ো আকারের মেমোয়ার্স –ডাউন মেমারি লেন স্টোরি।

-কি নাম দিচ্ছেন?

-দুটো নাম ভাবছি। একটা হচ্ছে পিছারার খাল। ওটা বরিশালি ঢঙে। আরেকটা মান ভাষায় বিষাদবৃক্ষ।

-দুটো নাম হিসেবে চমৎকার লাগছে। কবিতা পড়েন?

-কম। জীবনানন্দে আটকে আছি। শঙ্খ ঘোষ মশাই-এর কিছু কিছু কখনও পড়ি। একবারে অধুনা কালের কবিদের সঙ্গে, বরিশালি জবানে বললে, বলতে হয় – ব্যাড়ে পাই না। আমি পড়াশোনার ব্যাপারে আপটু ডেট নই। পরন্তু স্বভাবে অলস এবং মস্তিষ্কে চঞ্চল।

-অন্য ভাষায় কিছু?

–অন্য ভাষা বলতে তো এক ইংরেজি আরর প্রাচীন দেবভাষা। ইংরেজি রোমান্টিক পোয়েটসদের সীমায় আবদ্ধ, তাও মূলত ওয়ডর্সওয়র্থ এবং কীট্স ইত্যাদি হাতে-গোনা দু-একজন। বাংলা অনুবাদে রুশী, ফরাসি, জার্মান দু-একজনের ছুটকো ছাট্কা তাও অনেক আগগে যা পড়েছি। এখন প্রায় না। সংস্কৃত অন্বয় ভেঙে প্রাচীনদের কাব্য নাটক ইত্যাদি। নিয়মিত না আমার পাঠস্থানে রাহু। বৃহস্পতি বক্রী, বোধে বুধস্থানে কেতু। সুতরাং আমাকে তদনুসারে বিচারে রাখবেন ভূমেনদা।

ভূমেনদার সঙ্গে সেই সূত্রপাত। ভেবেছিলাম তাঁর সঙ্গে আড্ডার শুরুয়াৎ যেমন হয়েছিল, সেটা ক্রমে চূড়ান্ত হয়ে গিয়ে ক্ষীর হয়ে উঠবে। কিন্তু সমস্যা ছিল আমাদের পারস্পরিক অবস্থানের দূরত্ব। তথাপি কখনও পার্থশঙ্করের নয়া উদ্যোগ –এ একটা দোতলার কুঠুরির আড্ডায় দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা আদানপ্রদান কম হয়নি।

ইতিমধ্যে ২০০৩ থেকে ২০০৫ –এর কোনও একদিন তিনি সুবর্ণরেখায় বসে বসে বললেন, বিষাদবৃক্ষতো বেরোলো। বিক্রি-বাটাও নাকি ভালোই হচ্ছে, ইন্দ্রনাথ বলছিলেন। তা ভদ্রেশ্বরের ভবনে একদিন মধ্যাহ্নের জাব্নার ব্যবস্থা হয় না স্যার? ইন্দ্রদা বলেছিলেন , শোন্, আমরা তিনজন যাব। ভূমেনদা, কল্যাণবাবু এবং আমি। ভূমেনদার সমস্যা নেই। শাল পাতা, ঝোপঝাড়, ডাঁটা মা-টা খাওয়া মানুষ। কিন্তু আমরা দুজন ঘোর আমিশাষী। আমাদের মাছ মাংসের ব্যাপারে হাঁসমোষ, শুয়োর গরুর বিচার নেই। বৌমাকে বলিস। তবে-তবে? উত্তরটা ভূমেনদা দিলেন, তবে আমরা তিনজনই একটু দাঁতের সমস্যার মানুষ। বিশেষত আমি। তাই খাদ্যাখাদ্যের চতুর্বর্ণের মধ্য আমি এখন শুধুমাত্র চতুর্থ বর্ণকে অর্থাৎ পেয়কে আশ্রয় করেছি। ওঁরা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় সব কটা বর্ণেরই গ্রাহক আছেন। আমার বাপারটা ইন্দ্রনাথ সঠিকই বলেছেন, আমি চর্ব্যের মধ্যে শাক, ডাঁটা একরাশ চিবোতে পারি। সাধারণত লিকুয়িড-এ থাকাই এখন পছন্দ।

বললাম, পেয়র কুল গোত্র কি? ভুমেনদাই এবারও সিদ্ধান্ত দিলেন, বললেন, ভাববেন না স্যার। আমরা ছাই-পাঁশ খেতে পারি। তবে গেরস্থের সেজন্য পথে দাঁড়াতে হবে না। বাড়িতে পাচ লিটারের জেরিকেন আছে? না হলে একটা নতুন কিনে নেবেন। এক জেরিকেন মহাত্মা গিন্ধধি নিয়ে রাখবেন। তাতেই হবে। বললাম মহাত্মা গান্ধি মানে? ভূমেনদা খুব বিরক্ত হয়ে কল্যাণদাকে বললেন, পরিভাষায় পোক্ত নয়। বুঝিয়ে দিন। কল্যাণ চৌধুরি বললেন, নাবালকদের শিক্ষা দেওয়া তো আমাদের কর্তব্য। মহাত্মা গান্ধি মানে বাংলা মদ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ো বৎস। স্বদেশী আন্দোলন, বিলিতি দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি। ধুত্তারিকা, কত আর শাখাব?

সত্যি কত আর শেখাবেন। তবে ভূমেনদার সঙ্গে প্রথম দিনের প্রথম সাক্ষাৎকারের বিড়ি ফোঁকা এবং সিগারেট টানার আব্ছা এবং অসমাপ্ত শিক্ষাটা যেন ‘The Scalpal the Sword’ নামক প্রখ্যাত গ্রন্থটির স্বনামধন্য অনুবাদকের মহাত্মা

গান্ধি, পদবন্ধটির প্রয়াসে পরিষ্কার হল। এযেন একেবারে ডঃ নর্মান বেথুনের অসামান্য Scalpal-এর দক্ষ অস্ত্রোপচার। দিশি মদ যেহেতু মহাত্মা গান্ধি লেবেলযুক্ত হয়ে স্বদেশী মহিমা-প্রাপ্ত, সাদারঙের ঔপনিবেশিক বর্তনিয়ার হাত ধরে আসা সিগারেটও তেমনি স্বদেশি বাদামি রঙের বিড়ির তুলনায় পরিত্যাজ্য। সেখানে স্বদেশীয়ানার চাইতেও আরও খানিকটা প্রগতিশীল অগ্রশ্রেণীর পেয়ারেরর সামগ্রী সে। সে শ্রমিক কৃষকের একদার তামুকের একমাত্র বিকল্প "উৎকৃষ্ট স্বদেশী নেপানী তামাকে প্রস্তুত জঙ্গল খন্ডের পত্রাবরণে ভূষিত বিড়ি।" সুতরাং -। কিন্তু এতটা যখন শিখে ফেলেছি, তখন আর সুতরাংটা থাক। ভুমেনদাকে বলতে বললেন, আপনার হবে। ধরতাই ভালো।

সন তারিখ বছর ছিত ঠিক মনে নেই। তবে এক বাসন্তী পূর্বাহ্নে তাঁরা এলেন। এঁদের মধ্যে এক ইন্দ্রদার মহিমা আমার কিছুটা জান ছিল। কল্যানদা সাংবাদিক – শ্রেষ্ঠ, শুনেছি। তখনও তাঁর নর্মান বেধুনের জীবনীর অনুবাদিট আমার পড়া হয়নি। শুনেছি, তিনি ফ্রন্টলাইন ম্যাগাজিনে নাকি শক্ত শক্ত প্রবন্ধাদিও লেখেন। একবার তাঁর অফিসে একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা ভূমেনদার পরামর্শেই। কিন্তু দেখা হয়নি। নাম মনে নেই দক্ষিনের একটা আবাসিক হাই-ফাই ইস্কুলের জনা-বিশেক বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্ররা, তাদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি লিখে, সেগুলো অতি গোপনে লোকমারফরত পাঠিয়েছিল। ওই অভিভাবকদের মধ্যে একজন আমার বন্ধু ছিলেন। চিঠিগুলোতে মারাত্মক অভিযোগ এবং ঘটনার বিবরণ ছিল, যা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বন্ধু বলেছিলেন, যদি দি হিন্দুতে ব্যাপারটা প্রকাশ করা হয়, একটা কাজের হবে। ভূমেনদা আর ইন্দ্রদাকে বলায় কল্যাণদা মারফত তাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যাপারটা নিয়ে মস্ত শোরগোল হয়েছিল এবং সরকারি হস্তক্ষেপেও ঘটেছিল। তবে তার বিস্তারিত আমার জানা হয়নি।

সেদিন আমার ভদ্রেশ্বরের ভদ্রাসনে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ মৈত্রেয়-কল্প তুষিত-স্বর্গের উদ্যান বিকশিত হয়েছিল। গৃহিনী তাঁর কর্মস্থলের বিদ্যাপীঠ থেকে পরীক্ষা নিবন্ধন ছুটি নিতে পারেননি বলে অস্বস্তি প্রকাশ করছিলাম। ভুমেনদা বলেছিলেন, এ-বড়ো উত্তম হয়েছে। পানীয় এবং গৃহস্থিনীর সহাবস্থান সুখের তো হয়ই না। আসলেই সমস্যাটা সার্বজনীন এবং তার সবিশেষ কারণও আছে। ইন্দ্রদা বলেছিলেন, এইসব সাত পাঁচ ভেবেই আমি আদিবাসী সমাজের থেকে গৃহিনী সংগ্রহ করেছি। অবশ্য ব্যাপারটা সত্যিই তেমন নয়। তবে তাঁর স্ত্রীকে আমি এই বিশেষ ব্যাপারে সহনীল এবং সঙ্গদান-কারিণীই দেখেছি।

দশটা নাগাদই তাঁরা এসেছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতে সবার পানপাত্র এবং সঙ্গে একটা সামুদ্রিক পায়রাচাঁদা নামের এক পূর্ণ-বারকোষ মাছ-ভাজা। মাছটা নিয়ে

ভূমেনদা কিছু কৌতূহল দেখাতে কল্যাণদা তার ঠিকুজি কুলুজি অনেক কিছু বলেছিলেন। কিন্তু সেসব আর মনে নেই। আমাদের বাজারে অনেকে মাছটাকে সার্ডিন মাছ বলত। কিন্তু একজন জেলে বলেছিল, ওটা সার্ডিন নয়। পায়রাচাঁদা বলি আমরা। যাই হোক, মহাত্মা গান্ধি এবং স্বাস্থ্যবান সেই মাছটি সবার কাছেই রোচক হয়েছিল এবং ভূমেনদা জীবনানন্দের ক্যাম্পে কবিতাটি থেকে খই-হরিণীর মাংস বিষয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আবৃক্তি আবৃত্তি করেছিলেন। মাছটার সঙ্গে হরিণের মাংসের আকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য ছিল। কথাটা রূপক করলেন, আমর আমাদের পান সংক্রান্ত সমস্ত স্থূল চুটকুলা মুহূর্তে সারস্বত আলোচনায় প্রস্থান নিল। নামক বইটিতেই জানবেন। জানবেন আরও অনেক কিছুই। তবে এখানে তার কিছু আভাস ক্রমে দিচ্ছি।

সেদিন ভদ্রেশ্বরের আড্ডায় পান ভাজন শেষ হতে বেলা দুটো। কাতলা মাছের পেটিটা ইন্দ্রদা বেশ তারিয়েই খান, জানতাম। কল্যাণদাও যে সে ব্যাপারে রসিক তা জানার সুযোগ আগগে-পরে আর হয়নি। তবে ভূমেনদা মাছ বা মাংসাহারে প্রকৃতই কার্ডিয়াক-বিশেষজ্ঞ। একটা ছোটো গাছের গল্‌দা এবং সামান্য দু-টুকরো মট্‌ন খেলেন তিনি। আমার ছোটো কন্যা পরিবেশন করছিল। লালশাকের পাত্রটা ভূমেনদা তাকে দেখিয়ে ইশারা করলেন, ওইটা, ওইটা,। এছাড়া নজরে পড়ার মতো চিবোলেন সজনের ডাঁটা। ডাক্তার মানুষ। জানি না, ওই বস্তুগুলোর মধ্যে হার্ট, লিভার ইত্যাদি সংরক্ষণের কোনও গুণাবলির কথা জানতেন কি না।

যাহোক, আমাদের প্রকৃত আড্ডা শুরু হল আড়াইরটে থেকে এবং চলল সাড়ে পাঁচটায় যখন তাঁরা বিদায় নিলেন, তখন পর্যন্ত। এই আড্ডার প্রধান বক্তা ছিলেন ভূমেনদা স্বয়ং। আমরা, বিশেষ করে আমি গল্প শোনার বায়নায় একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম। পরবর্তী অধ্যায়ে ভূমেনদার সেই অনবদ্য, প্রায় ধ্রুপদী পরন কথার কাহিনির কিছুটা জানাব।

আগের দু-একটা আড্ডায় ভূমেনদার মুখে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ, পূর্বাশা পত্রিকা ইত্যাদি কিছু ছেঁড়াখোঁড়া গল্প-কাহিনি শুনেছি। শুনেছি, তাঁর সম্পাদনায় ময়ুখ নামক ক্ষীণকলেবর ক্ষণজীবী কবিতা পত্রিকাটির কথা। এদিন সেইসব কথাই বিস্তাতিরত শোনার আগ্রহে তাঁকে বললাম, এতক্ষণ তো, সকাল থেকে মহাত্মা গান্ধি পানে আর চট্‌কুলা গলেপ সময় কাটালাম, এবার একটু গুছিয়ে আপনার পত্রিকা এবং কববিতা ইত্যাদি নিয়ে অভিজ্ঞতার গল্প বলুন তো। ভূমেনদা তাঁর দেওয়া বই কখানার মধ্য থেকে জীবনানন্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং ভূমেন্দ্র গুহ বইটা তুলে বললেন, সসব কথা জানার যদি ইচ্ছে হয়, এই বইটি একটু কষ্ট করে পাতা উলটে দেখবেন স্যার। লেখা হয়তো ওখানেই যা বলার বলেছি। কল্যাণবাবু কি বইটা আগে দেখেছেন? কল্যাণদা বললেন, না। এবার এক কপি কিনব। ভূমেনদা বললেন,

কিনবেন? আমার বই? তবেই হয়েছে। তাতে কাজ নেই। আমি কালই ইন্দ্রবাবুর সুবর্ণরেখায় এক কপি রেখে আসব বরং। যদি কিনতেই চান, পয়সাটা আমার হাতেই দেবেন। প্রকাশক আমার পয়সায়ই ছেপেছেন, তাঁর খুব ক্ষতি হবে না। আমিও লিখে পয়সা কামালুম, এমন একটা স্বাদ পাব। আমি বললাম, আমি কি পয়সা দেব? ভূমেনদা বললেন, আপনার বই তো আমি কিনিনি, তাই সেটা শোধবোধ হয়ে গেল। সম্ভবত, পার্থশঙ্করকে আমি বলেছিলাম ভূমেনদাকে বই দেবার জন্যে, ঠিক মনে নেই।

কথায় কথায় ভূমেনদা সেদিন সঞ্জয়বাবু এবং জীবনান্দ তথা তাঁদের কবিতা ও নানান লেখাপত্তর নিয়ে অনেক অদ্ভুত কাহিনি বলেছিলেন। পরে ওই বইখানা পড়ে সে-সবের বিস্তারিত অনুপুঙ্খে জেনেছি। তার সবটা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। সন্ধিৎসুর ভূমেন্দ্র গুহ, জীবনান্দ এবং সঞ্জয়বাবুরর পূর্বাশা পত্রিকা সম্বন্ধে সেখানে ব্যাপক খবর পাবেন। ভূমেনদা তাঁর দুর্ধর্ষ গদ্যে প্রকৃত আখ্যানরসে সিক্ত করে সেসব পরিবেশন করেছেন। কাজটি করতে তাঁর রক্তক্ষরণ কম হয়নি।

আমি তখনও ভূমেনদার কোনও কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ বা খুচরো কবিতা কিছুই পড়িনি। বস্তুত তাঁর সঙ্গে আমার সেরকম ঘনিষ্ঠতা কখনোই গড়ে ওঠেনি। তাঁর বিষয়ে প্রথম অনেকটাই জানলাম, তাঁদের ওই তিন বন্ধু আমার ভদ্রেশ্বরের ভদ্রাসনে একদিনের অতিথি হিসেবে পাওয়া পর। নয়া উদ্যোগে গতায়াত কালে জানতাম ভূমেনদা কবিতা লেখেন। সেই সময়টা নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময়। আমি তখন সবে লেখালেখির জগতে ঢুকেছি। আমি আধুনিক কবিতা বা কাব্য বলতে রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী কল্লোল-যুগীয় কবিদের দু-একজনের লেখাই কিছু কিছু পড়েছি। কি কারণে জানি না, সমবয়সি তরুণ, যুবাদের মতো আধুনিক কবিতার আগ্রহী তথা বোদ্ধা পাঠক আমি কোনওদিনই হতে পারিনি। একমাত্র ব্যতিক্রম জীবনান্দ। যদিও জীবনান্দকে অনেকেই দুর্বোধ্য বলত। কিন্তু আমি আজ আবধি যা যতটুকু বুঝি, তা তাঁকেই। আসল কথাটা এই যে কবিতার আমি খুব একটা আগ্রহী গ্রহক নই। সুতরাং ভূমেনদা ভালো কবিতা লেখেন, না তাঁর উপরে জীবনানন্দ, সঞ্জয়বাবুদের মতো কবিদের প্রচ্ছায়া ক্রিয়াশীল এরকম মন্তব্য করা আমার একান্তই অনধিকার। তববে তাঁর গদ্য যা যতটুকু পড়েছি, তা অনবদ্য মনে হয়েছে এবং এখনও আমি ভাবি যে তিনি যতটা জীবনানন্দ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের জন্য, তাঁদের সৃষ্টি এবং কার্যাবলির জন্য ভাবিত ও সক্রিয় ছিলেন, তার সিকিভাগও নিজস্ব সৃষ্টির জন্য সময় দেননি। এটা শুধু তাঁর বিষয়েই বলছি না। জাবনান্দ মারা গেলে ভূমেনদা এবং ময়ুখ-এর জীবনানন্দ সংখ্যাটি নির্মাণ সম্ভব করেছিলেন, তাঁদের সবার প্রতি প্রণাম জানিয়ে কথাটি নিবেদন করছি। সেই গল্প ভূমেনদা সেদিন শুনিয়ে ছিলেন।

নানারকম সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য উপায়ে পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ এবং কৃচ্ছ্রতাময় দিন যাপনের কথায় অনবদ্য সেই কাহিনি। ভূমেনদার বন্ধুদের

একজন, যাঁর নাম প্রতাপ, তিনি লিখেছেন, কথায় কথা বাড়ে। গোঁয়ার ভূমেন হুট করে, বলা নেই কওয়া নেই তার ডাক্তারির মোটা মোটা বইগুলো বিক্রি করে দিল। বইগুলো বেশ যত্ন করে রাখত ভূমেন, প্রায় নতুন বইগুলো থেকে বেশ টাককা পেল।...ভূমেনের কান্ড দেখে স্নেহাকরের মাথায় হাত। আমরাও জোর ধাক্কা খেলাম।...প্রথমেই ঘড়ি আংটিতে হাত পড়ল। স্নেহাকরের নতুন চাকরি, সেখানে স্বল্প পরিচিত সহকর্মীদের কাছে হাত পাততে হল তাকে। জগদিন্দ্রের অবস্থা ভালো, তবু তাকেও তো সংসারের হিসেব মেনে চলতে হয়, বাড়ি কর্ত্রী মা, জগদিন্দ্রের বাবা তখন পাকিস্তানে। জগদিন্দ্র প্রথমে কলেজের মাইনে, পরে পরীক্ষার ফি, তারপর সেশন ফি (টিউটোরিয়ালের)- এমন সব প্রয়োজন দেখিয়ে টাকা এনে দিল।...এত করেও শেষ রক্ষা হল না। হোটেলের ওড়িয়া ঠাকুর সময়ের সব কটি টাকাই হাতিয়ে নিল, প্রচুর ধার মেটাতেই সমর প্রায় দেউলিয়া হল, সমরের জন্য আমরা চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম।

টাকা জোগাড় করার অসাধারণ সব ফন্দির গল্প সেদিন বলেছিলেন ভূমেনদা। ময়ুখ-গোষ্ঠীর গোটা দঙ্গলটাই ছিল জাত বোহেমিয়ান। ভূমেনদা এ বিষয়েও তাঁর বন্ধু প্রতাপের লেখা নিবন্ধ থেকে জানালেন, প্রতাপ লিখছে, সেদিন সকাল বেলা সমর আমার বাড়িতে এসে আমাকে ডেকে তুলল, আমি একটু দেরী করেই ঘুম থেকে উঠতাম। ওরর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ওর মনের অবস্থা বুঝি।

আমি বেকার টিউশনি ভরসা। সেখানে ছটি বাড়িতে মার অসুখ বলে টাকা ধার করেছি ও ময়ূখকে দিয়েছি। চা (চরণামৃত) সিঙ্গাড়ার যে দাসিয়ার দোকান, সেখানে চা-সিগারেটের ধার শোধ না দিয়ে সে টাকাও দিয়েছি। গল্পের বইগুলো তো স্নেহাকরের পাল্লায় পড়ে আগেই বিক্রি করেছি। আমারর অবস্থা সবথেকে খারাপ, এখন আমি কী-ই বা করতে পারি?

সমরের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে প্রতাপের ভূমেনদার কথা মনে পড়েছিল। তিনি আগের দিন সন্ধেয় ময়ুখ-এর আড্ডায় হাসপাতালের গল্পকথা প্রসঙ্গে রক্ত বিক্রির কথা বলেছিলেন। সেই সময় সংস্কার ও অজ্ঞতাবশত রক্ত দেওয়া, রক্ত বিক্রির কথা কেউ ভাবতেও পারত না। ভূমেনদার প্রস্তাবে সবাই কেন চমকে উঠেছিল, স কথাও প্রতাপের জবানিতে ভূমেনদা বলেছিলেন। ভূমেনদা বললেন, প্রতাপ লিখেছে, ভূমেন বলেছিল রক্ত বিক্রির পরে হাতে হাতে টাকা পাওয়া যায়। কলা দুধ পাঁউরুটু সন্দেশ ফ্রি পাওয়া যায়। খাসা ব্যবস্থা । সুতরাং ছয় বন্ধু মিলে রক্ত বিক্রি করলে ছ দশং ষাট টাকা মবলগ রোজগার, উপরন্ত একবেলার বা সারাদিনেরই খাওয়া ফিরি। ভূমেনদার বলা গল্পটা এবার সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বলি। প্রতাপ বলছিল, সমরের চেহারাটা একেবারেই মড়া পোড়ানো, গেঁজেল মার্কা চেহারা। সে ভাবল, সমর সম্ভবত রক্ত বিক্রির কথাই ভাবছে।

কালীঘাটের দিকে যাচ্ছিল তারা। সমরকে প্রতাপ বলেছিল, ময়ূখের জন্য আমি জীবন দিতে পারি, কিন্তু রক্ত বিক্রি করতে পারব না। সবীর দুর্বল, রক্ত দিলে আমি সত্যি মরে যাব। সমর প্রতাপকে বলেছিল, তোকে মরতে হবে না। কিছুই করতে হবে না। শুধু দুটো মিশে কথা বলতে হবে। ওতেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। কোনও বিপদ নেই। তোর হাতেই ময়ূখের সম্মান। ভেবে দেখ।

সমরের কথার হেঁয়ালি না বুঝে কালীঘাটের মন্দিরের পিছনের দেওয়াল ছুঁয়ে প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করল যে সমরের কথা সে শুনবে। তিন কান হতে দেখে না কথাটা। কিন্তু কাজটা কী? সমর কেওড়াতলার শ্মশানঘাটার শ্মশান-বন্ধ বলে খ্যত চা-সিগারেটের দোকানে দরাজ ভরে খাওয়াল প্রতাপকে। বলল তোকে স্নেহাকরের দাদা সুধাকরের বাসায় যেতে হবে। স্নেহাকরের মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রতাপ আঁতকে উঠে বলেছিল, অসম্ভব। সুধাকারদার ধারণা, স্নহাকরের সর্বনাশের মূলে আমার এই ময়ুখের ছেলেরা। নইলে সে বিলেত-ফিলেত না গিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে যত্রতত্র হট্ট বাস করে, আর মূল শয়তান তো আমি। আমাকে একলা পেলে সুধাকরদা মুরগির মত টেনে ছিঁড়ে ফেলবে নির্ঘাত। বাঘা পাইলট মানুষ, তাঁর ইয়া একখানা পাঞ্জার থাপ্পড় খেলেই অক্কা পেয়ে যাব।

সমর তাকে জানিয়েছিল যে সে ভয় নেই। কারণ তিনি এখন আগরতলা গৌহাটি ফ্লাইটে। মাসিমা এখন পুজোর ঘরে ব্যস্ত। বাসায় গিয়ে প্রতাপ হাজির হলেই তিনি এক ফাঁকে তার সঙ্গে কথা বলবেন। অসম্ভব স্নেহ করেন তিনি প্রতাপকে, একথা সবাই জানে। কিন্তু কথাটা কী?

গল্পটা হল, সমর বলেছিল, প্রতাপ মাত্র পঞ্চাশটা টাকা পেলেই টাইপটা শিখে নিতে পারে। আর টাইপটা শিখলেই তার চাকরিটা হয়ে যায়। পাকিস্তান থেকে এখন টাকা আসছে না তাই চাকরির ব্যবস্থাটাও সে করতে পারছে না। স্নহাকরের মায়ের হাতে এখন টাকা আছে, সমর জানে। তিনি কথাটা শুনলে না করেত পপারবেন না। ময়ূখের বাঁচা মরার স্বার্থে এইটুকু মিথ্যাচার প্ররতাপকে করতেই হবে। তাকে টাকাটা চাইতেই হবে না। মাসিমার যা দয়ার শরীর, টাকাটা আপ্‌সেই প্রতাপের হাতে চলে আসবে। ভূমেন বলছিলেন, প্রতাপ পরে লিখেছে, সমরের চা-সিগারেটের আপ্যায়নটা তখন মনে হয়েছিল যেন কালীঘাটের হাঁড়িকাঠে গলা দেওয়ার আগের পাঁঠাগুলোকে গাঁদাফুলের মালা পরানো। কারণ, সমর আমাকে আর বেশি ভাবতে দেয়নি। গড়িয়াহাটের কাছে সেই রাসবিহারীর দোতলায় স্নেহাকরের দাদার বাসায় আমাকে ঠেলে তুলে দিয়ে এল। আমাকে দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েই সে কেটে পড়ল।

সুতরাং তোতা পাখির মতো পাকিস্তান থেকে টাকা না আসা, টাউপের ক্লাশে ভর্তি না হতে পারা এবং চাকরিটা না হওয়ায় দুঃখ তাও মাত্র পঞ্চাশটা টাকার জন্য ইত্যাদি মুখস্ত করতে করতে স্নেহাকরের মা বেরিয়ে এলে তাঁকে এক নিঃশ্বাসে বলে

আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতে থাকা। কিন্তু সমর তাকেও ভুল অথবা মিথ্যে খবর দিয়েছিল। সুধাকরদা সেদিন এইবাসাতেই ছিলেন। স্নেহাকরের মা প্রতাপের দুঃখ কাহিনি শুনেই খুব ব্যথিতি হয়ে পরেছিলেন। খানিক ভাবলেন। তার পর সুধা, সুধা বলে হাঁক পাড়লেন। সুধাকর বেরিয়ে আসতেই তাঁকে বললেন, তুই প্রতাপকে পঞ্চাশটা টাকা দে তো। চাকরি হচ্ছে না, লেখাপড়াও করছে না, এর পর তো ইস্টিশানের কুলি হবে।

সুধাকরদা দ্বিরুক্তি না-করে টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলেন প্রতাপকে। কী করে যে সেদিন টাকাটা হাত পেতে নিয়ে প্রায় চোরের মতো পালিয়ে বেঁচেছিল প্রতাপ এবং প্রায় চোরের মতো সিঁড়ি দিয়ে নেমে পা হড়কে পড়ে যেতে যেতে বেঁচেছিল, সে কথা আর বলার মতো না। সিঁড়ির নীচে কোথায় লুকিয়েছিল সমতর, সে এসে তাকে ধরে না ফেললে, হাড়গোড়া ভেঙে হাসপাতালে থাকতে হত।

এইরকম রকমারি হব কথা প্রায ইতিহাস বিবৃত করার মতো করে ভূমেনদা সেদিন কত যে বলেছিলেন তার সবটাই এই বইটিতে অধিকাংশ পেয়েছি বটে, তবে সেটা তো আর লিঙ্ক স্টোরি নয়। কথাগুলো, গল্পগুলো, বই-এ পড়া, আর ভূমেনদার মুখে সেই অনবদ্য ভঙ্গীতে শোনা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কিন্তু একথাও বলব, বইখানা এখনও যখন চোখের সামনে খুলে ধরি, তখন তার পাতার উপরে ভূমেনদার সেই বিখ্যাত হাসিমাখা মুখটা যেন স্পষ্ট ভেসে ওঠে। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, মিথ্যে মনে হয় তাঁর আজকের এই অস্তিত্ব। মনে হয়, এক্ষুনি বুঝি মানুষটি বলে উঠবেন, জেরিকেনের তলানিটা রাখবেন। ওটা আমার বেলা শেষের পারানির পাথেয়। এখন চলুন, ওঠা যাক। আচ্ছা মিহির, যে ঘাট পেরিরেয় এসেছি, সেটাতো ভদ্রেশ্বরের শ্মশান ঘাট, তাই না? বস্তুত, সেদিন বিদায় কালে তাঁদের তিনজনকে যখন ভটভটিতে টলটলায়মান অবস্থায় তুলে দিয়েছিলাম, ভূমেনদা তখনই বলেছিলেন কথাটি। বলেছিলেন, এলামও শ্মশান ঘাট পেরিয়ে, ফিরছিও শ্মশান ঘাট পেরিয়ে, ফিরছিও শ্মশান ঘাট পেরিয়ে। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় এবং তাৎপর্যের কিন্তু।

ব্যাপারটা তাঁর শেষ প্রয়াণের দিনে, এক বন্ধু মারফত ফোনে খবরটা পেয়ে মনে পড়েছিল। এবারের যাওয়াটা একেবারেই যাওয়া। কোনওমতেই আর একবার ফেরার নয়। শত সংস্কারকে, প্রত্যাশাতে দার্শক্ষনিকতায় সমৃদ্ধ করেও আজ আমরা আর তা বিশ্বাসে আনতে পারি না। গেয়ে উঠতে পারি না – আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে।

ভূমেনদার বিষয়ে এরকম একটা রচনা লিখতে বসতে হবে, এমন কোনওদিন ভাবিনি। তাও ভাবছিলাম, পাকে-চক্রে যখন লিখতেই হচ্ছে, কিছু হালকা কথার মশকরা করেই দায় সারব। কিন্তু সেদিনের আড্ডার দ্বিতীয়ার্ধের জীবনানন্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং ভূমেন্দ্র গুহের কাহিনির কথকতা বিষয়টাকে আর মশকরার মধ্যে থাকতে দিল না। কিন্তু সে আলোচনার বিন্যাসে গেলে এই নিবন্ধ পাঠকেরা শুধু ভুমেনদার ওই তুলনা-রহিত বইখানির চর্বিতচর্বণটুকুই শুধু পাবেন এবং আমাকে

অক্ষমনীয়র অপরাধে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। তার চাইতে ভালো, বইখানি তাঁরা বরং কষ্ট করে সংগ্রহ করে পড়বেন এবং এই দীর্ঘকালীন মানসিক বিপন্নতায় বিষণ্ণ হবেন। যে বিপন্নতা এবং বিষণ্ণতায় উক্ত ব্যক্তিত্রয় তথা ময়ুখ, অনুক্ত, বিশেষ করে পূর্বাশা প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আজীবন দগ্ধেছেন।

আমি ভূমেনদাকে জানবার বা বুঝবার মতো যথেষ্ট সুযোগ পাইনি। তাছাড়া, আগেই বলেছি আধুনিক কবি, কাব্য এবং কবিতা-এর কোনওটাই আমার বুদ্ধি ও মননের জন্য নয়। তথাপি ভূমেনদাকে যতটুকু বুঝেছি তা তাঁরই সহয়োগী এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধু স্নহাকরেরর লেখা কয়েকটি পঙ্‌ক্তি (ভূমেনদার ওই বইটি থেকেই ধার নিয়ে) উদ্ধৃত করে আমার নিবন্ধটি শেষ করছি। পঙ্‌ক্তিগুলো পড়ে আমার ম নে হয়েছে ভূমেন্দ্রগোষ্ঠী এবং তাঁদের পিতৃপুরুষ জীবনান্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সকলেই যেন ওই বোধে বিপন্ন, বিষন্ন এবং আত্মধ্বংসকারী সাধক। পঙ্‌ক্তি কটি এবার বলি,

আমি অস্তিত্বের চামড়া ছাড়িয়ে মেলে দিতে যাচ্ছি
উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত,
আর সামান্যতম টান পড়লেই আমি
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবো, এমন
অনুভবসিদ্ধ অস্তিত্বের কথা মানুষকে বলে যেতে চাই,
এবং সেই ভাষা পৃথিবীতে জানে শুধু
মানুষের প্রকৃত জীরবতা
অথবা কবিতা।

পরে এই গ্রন্থটি পাঠ করে এবং ময়ূখ-গোষ্ঠীর অথবা বলা ভালো ভূমেন্দ্র-গোষ্ঠীর পরিণতি জ্ঞাত হলাম, বিশেষ করে ভূমেনদার শেষ সমাচার যখন এল, কী কারণে জানি না আমার মনে হল, তাঁরাও নতুন কিছু বলেন নি। এই সত্য উপলব্ধি তো মহাভারতকার লিখেছেন,

সর্বে ক্ষয়ান্ত নীয়োঃপতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তাঃ মরণান্তং চ জীবিত্‌ম।।

সব সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। এর কোনও ব্যতিরেক নেই। এটাই বোধহয় মানুষের প্রকৃত নীরবতা অথবা কবিতা বলে ভূমেনদারা গ্রহণ করেছিলেন।